২১ আগষ্ট : ২০০৪ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট বিকেলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় অফিস (২৩ বঙ্গবন্ধু এভিন্যু) থেকে এক প্রতিবাদী মিছিল শুরু করতে চেয়েছিল। প্রতিবাদ ছিল সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ সহিংস অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার কারণে, দাবী ছিল সরকারের তাৎক্ষণিক পদত্যাগের। মিছিল শুরু করার আগে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। আশা করা হয়েছিল শেখ হাসিনা মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন।

বিকেল ৩টা থেকে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে লোকজন জমায়েত হতে শুরু করেন। আমি পৌঁছি সাড়ে চারটার দিকে। প্রায় ৫০ হাজার লোক- আওয়ামী লীগ কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ-তখন কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে ও চারদিকে। দেখলাম রাইফেল ও কোমরে পিস্তল নিয়ে প্রায় ৫০ জন পুলিশ, পশ্চিম দিকে এভিন্যুর প্রবেশ পথে দাঁড়ানো। তেমনি ৫০ জন এভিন্যুর পূর্বদিকে। তারা নীরব দর্শকের ভূমিকায়, সভা বা মিছিলে যোগদানকারী লোকজনের উপর নজর রাখা বা প্রয়োজনে তাদের তল্লাশী করায় তাদের কোনও মনোযোগ নেই। এভিন্যুর উপরে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসের পূর্ব পাশে বাটার দোকানের দক্ষিণে একটি ট্রাক দাঁড় করানো ছিল। ট্রাকের উপরে কয়েকটি মাইক্রোফোন সংযুক্ত একটি পোডিয়াম রাখা হয়েছিল। প্রেসিডিয়ামের সদস্যরা সাধারণত যেমনটি করেন তেমনি আমি ঐ সময়ের জন্য বানানো অস্থায়ী একটি সিঁড়ি বেয়ে পেছন দিয়ে ট্রাকটির ডেকে উঠে প্রেসিডিয়ামের অন্যান্য সদস্য, জিল্লুর রহমান, আমীর হোসেন আমু, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, শেখ সেলিম ও কাজী জাফরউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, আওয়ামী আইন পরিষদ প্রধান এডভোকেট সাহারা খাতুন, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এডভোকেট রহমত আলী, ত্রাণ ও কল্যাণ সচিব নাজমা রহমান ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার সাথে দাঁড়াই। ট্রাকটিকে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড় করানো হয়েছিল। বিকেল ৫টার দিকে শেখ হাসিনা পশ্চিম দিক থেকে তার বুলেটপ্রুফ মার্সিডিজ বেনজ জীপে চড়ে সভাস্থলে পৌঁছেন। তার জীপের সামনে একটি পাইলট পুলিশ প্রতিরক্ষণ পিক আপ ভ্যান আর পেছনে সেরকম দুটি ভ্যান ছিল। পেছনের প্রথম ভ্যানে ছিল তার প্রতিরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাদা পোষাকের এবং দ্বিতীয়টিতে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। দুটি পিক আপ ভ্যানের মাঝখানে দুটি এসইউভিতে (জীপে) তার ব্যক্তিগত কর্মচারীরা এসেছিলেন। এসব কর্মচারী ও পুলিশের সহায়তায় জনতার ভীড় এড়িয়ে তিনি ট্রাকের উপরে উঠেন, জনতাকে শুভেচ্ছা

জানিয়ে তার বক্তৃতা শুরু করেন। প্রায় ১৫ জন সাংবাদিক, টেলিভিশন কর্মী ও ফটোগ্রাফার ট্রাক-ডেকের বিভিন্ন অংশে ও নিচে দুধারে এবং ট্রাকের সামনের কেবিনের উপরে অবস্থান নিয়ে সংবাদ আহরণের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ট্রাক-ডেকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহ আমি শেখ হাসিনার পেছনে ও পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি ট্রাক-ডেকের পেছনে পশ্চিমমুখী হয়ে বক্তৃতা করছিলেন। ট্রাকটি এভিন্যুর মাঝখান থেকে প্রায় ৩ গজ উত্তরে, বাটার দোকান যে ইমারতে অবস্থিত তার কাছাকাছি, দক্ষিণ দিকের ইমারতগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে দাঁড়ানো ছিল। বক্তৃতারত শেখ হাসিনার বামদিকে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সেলিম ও জিল্লুর রহমান। এই দু'জনের মাঝে এক পা পেছনে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল। আবদুল জলিলের ঠিক পেছনেই ছিলাম আমি। আমার দু'পাশে ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক মুকুল বোস ও শেখ হাসিনার সহকারী হাজী নজীব। তার ডানদিকে ছিলেন যথাক্রমে প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও সাবেক মেয়র হানিফ। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও হানিফের এক পা সামনে ছিলেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। আমাদের সবাই পশ্চিমমুখী থাকায় সূর্যের আলো ও তাপ আমাদের চোখে ও শরীরে বেশ লাগছিল। পাঁচটা পনের'র দিকে, সূর্যের তাপে ও পেছনের লোকের চাপে শ্রান্ত হয়ে একজন পেছনের দিকে সরে আসলে শেখ হাসিনার ঠিক পিছনে আমি দাঁড়িয়ে যাই। এই সময় আমি নেত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার স্কোয়াড্রন লীডার (অবঃ) মামুনকে আমার বামদিকে এক পা পেছনে দেখতে পাই। মিনিট খানেক পরে তার পাশে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি বাহাউদ্দিন নাসিম এসে দাঁড়ান। তারা দু'জনই এর পর জিল্লুর রহমানের সামনে, শেখ হাসিনার পায়ের কাছে বসে পড়েন।

সমাগমে লোক হয়েছিল অনেক-আমার হিসাবে ১ লাখেরও বেশী। পশ্চিমে পীর ইয়ামেনী মাজার থেকে নূর হোসেন চত্বর পেরিয়ে সচিবালয়ের পূর্ব পাশের সড়ক ছাড়িয়ে মুক্তাঙ্গন (বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে আসার সময় জনতার ঢল দেখেছিলাম), পূর্বদিক বঙ্গবন্ধু ও ভাসানী ষ্টেডিয়াম এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে দক্ষিণের দুই সড়কের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গোলাপ শাহ্ মাজার পর্যন্ত সমগ্র এলাকা ব্যানার হাতে স্লোগানমুখর জনতায় ভরে গিয়েছিল। জনতার ভীড়ে আমি মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান ও হাসিনা মমতাজকে (মহানগর মহিলা লীগ নেত্রী) শ'খানেক মহিলা কর্মীদের নিয়ে ট্রাক থেকে ১০ গজ দূরে উত্তর-পশ্চিমে কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাদের পেছনে অন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন সাবেক মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ নাসিম, আবদুল মতিন খসরু ও ওবায়দুল কাদের। তাদের দক্ষিণে প্রায় ৭ গজ দূরে ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ প্রেসিডেন্ট বাহাউদ্দিন নাসিম। বাহাউদ্দিন নাসিম পরে ট্রাকের ডেকের উপরে আসেন এবং স্কোয়াড্রন লীডার (অব:) মামুনের সাথে বসেন। ভীড়ের মধ্যে আমি রফিক মোল্লাকে (আদা চাচা) দেখেছি। তিনি স্বভাবসুলভ ভাবে টিনের কৌটা থেকে সিদ্ধ

ও শুকনো আদা বের করে যারা স্লোগান দিচ্ছিলেন কিংবা বক্তৃতা করেছেন তাদের মাঝে হেসে হেসে বিতরণ করছিলেন। শেখ হাসিনার জীপ, ট্রাক থেকে প্রায় ১৫ গজ দূরে রাখা হয়েছিল। জীপ থেকে যথাক্রমের প্রায় ২০ ও ৬০ ফুট দূরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত পুলিশদের নিয়ে ছিল পিক আপ ভ্যান দুটি। এই দুটির মাঝে ছিল ২টি এসইউভি। শেখ হাসিনার জীপের সামনে ও ট্রাকের পেছনে ছিল পাইলট পিক আপ ভ্যান। এই সবগুলো গাড়ী জনতা ঘিরে রেখেছিল। এই গাড়ীগুলোকে একটি অনুকল্পিত নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রেখে জনতাকে তার বাইরে সরিয়ে নেয়ার কোনও চেষ্টা পুলিশ এ সময় করেছে বলে চোখে পড়েনি।

পুলিশ বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে সভাসমাবেশ করার জন্য আওয়ামী লীগকে কোনও মঞ্চ বা প্লাটফর্ম তৈরি করতে দেয় না। এজন্য এ স্থানে সভা সমাবেশে শেখ হাসিনার বক্তব্য দেয়ার জন্য এভাবে ট্রাক-ডেক ব্যবহার করা হয়। দুদিকে ইমরাত ঘেরা স্থানে ট্রাক ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ভয়ানক বিপদ সংকুল, চোরাগুপ্তা গুলি সহজেই আঘাত হানতে পারে। সাধারণত এ স্থানে শেখ হাসিনার সভা অনুষ্ঠানের দিনে ও সময়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস ইমারত ছাড়া দু'পাশের ইমরাতের ছাদে সশস্ত্র পুলিশ নিয়োজিত থাকে। তারা সম্ভাব্য চোরাগুপ্তা গুলি কিংবা বোমা বা পটকা ছোঁড়ার প্রতিকূলে পাহারা দেয়। ঐ দিন আমি এসব ইমারতের ছাদে পাহারায় নিযুক্ত কোনও পুলিশ দেখিনি। বিশেষত: ট্রাক-ডেক থেকে ২০ গজ দক্ষিণ-পূর্বের সিটি হোটেল ইমারত ও দশ গজ উত্তর-পূর্ব দিকে রাজ্জাকস্ নামে নিচ তলায় দোকান সংবলিত ইমারতের ছাদের উপরে সশস্ত্র বা টেলিসকোপিক বা ভিডিও ক্যামেরা সজ্জিত কোন পুলিশকে জনসমাগমের সময় দেখা যায়নি। সাধারণত: এরূপ সমাবেশের সময়ে এসব ইমারতের ছাদে পাহারায় নিয়োজিত পুলিশদের সাথে আওয়ামী লীগের কর্মীদেরও সতর্কতামূলকভাবে মোতায়েন করা হত। ঘটনার পরে সন্ধ্যার সময়ে আমি জানতে পেরেছি যে ঐদিন পুলিশ আমাদের কর্মীদেরকে এ দুটি ইমারতে প্রবেশ করতে বা তাদের সহ উপর তলা বা ছাদে যেতে দেয়নি। শেখ হাসিনা যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন ট্রাক-ডেকের দুপাশে, প্রায় ৩ গজ দূরে, জনতার মাঝে ৬/৭ জন পুলিশকে মিশে থাকতে দেখেছি। এই জায়গায় আগে এই ধরনের সমাবেশে যত সংখ্যক পুলিশ নিয়োজিত থাকত তার তুলনায় এদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। লোকজনকে ট্রাক বা শেখ হাসিনা থেকে একটি অনুকল্পিত নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে রাখা-যা রুটিন নিরাপত্তা রক্ষণমূলক কাজ হিসাবে আগে পুলিশ করত-তা এদিন এ সময়ে তারা করেছে বলে চোখে পড়েনি।

বিকাল পাঁচটা পঁচিশের দিকে শেখ হাসিনা যখন জয়বাংলা বলে তার বক্তৃতা শেষ করছিলেন, তখন আমি ফ্লাসের ঝলকানি দেখে ও বিস্ফোরণের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। শব্দ শুনে মনে হল, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে লোকজনের উপর দিয়ে একটি বোমা ট্রাকের দক্ষিণ দিকে রাস্তার উপর উপরে পড়েছে। আমাদের পেছনে কে যেন চিৎকার করে বললেন, এ যে গ্রেনেড। ট্রাক-ডেকের উপরে আমরা চমকে উঠলাম,

কিন্তু বিমূঢ় হলাম না। একে শেখ হাসিনার উপর বোমা বা গ্রেনেড হামলা ধরে নিয়ে আমরা তখনি তার চারপাশে মানব-দেয়াল গড়ে তুললাম। এরপর আবার আর একটি ফ্লাস আমার চোখ ধাঁধিয়ে ট্রাকটি পার হয়ে উত্তর-পশ্চিমে ট্রাক থেকে প্রায় ৩ গজ দূরে গিয়ে পড়ল। দেখলাম আইভি রহমানের দেহ রাস্তা থেকে প্রায় ৪ ফুট উপরে উঠে নিচে পড়ে গেল। এই মুহূর্তে মেয়র হানিফ চিৎকার করে শেখ হাসিনাকে বসে পরতে বললেন। তিনি বসে পরলেন কিন্তু মাথা উঁচু করেই রইলেন। স্কোয়াড্রন লীডার (অবঃ) মামুন তার বাম হাত টেনে তাকে শুয়ে পরতে ইশারা করলেন। তিনি ডেকের উপর লম্বালম্বি করে তার দু'হাত বিছিয়ে দিয়ে পশ্চিম দিকে ঝুঁকে গেলেন। আমরা সবাই ঝুঁকে ও হাঁটু আধা গেড়ে তার উপর ও চারদিকে মানব দেয়াল দৃঢ়তর করলাম। এভাবে ঝুঁকে যাওয়ার সময় আমি বা'হাতে প্রবীণ নেতা জিল্লুর রহমানকে টেনে ট্রাক-ডেকে শুইয়ে দিলাম। যদ্দুর মনে পরে দ্বিতীয় ব্লাষ্টটির পর ৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে আরও পাঁচটি ব্লাষ্ট হয়েছিল।

মনে পড়ছে ৭ম ব্লাষ্টটির পর গ্রেনেড বা বোমা হামলার যেন খানিক বিরতি এল। দেখলাম শেখ হাসিনার বুলেটপ্রুফ জীপটি ধীরে ধীরে ট্রাকটির দিকে, ডান দিকে সামান্য ঘুরে তিনি উঠলেই যাতে ট্রাকটি বাইপাস করে তা যেতে পারে সেজন্য এগুচ্ছে। আমরা ভাবলাম তাকে জীপের দিকে নিয়ে যেয়ে জীপে উঠাতে পারলে তিনি নিরাপদ হবেন। হামলা শেষ হয়েছে ভেবে সহযোগীরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তাকে ট্রাক থেকে নামার অস্থায়ী সিঁড়ি ধরে নামিয়ে জীপের সামনের সিটের দিকে নিয়ে গেলেন। স্কোয়াড্রন লীডার (অব:) মামুন সিঁড়ির উপর থেকে ঢালের মত দাঁড়িয়ে তাকে প্রতিরক্ষণ দিয়েছেন, সহকারী হাজী নজীব ও তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার মেজর (অব:) শোয়েব নিচে দাঁড়িয়ে তাকে নামতে সাহায্য করেছেন। এরূপ প্রতিরক্ষণ ও সহায়তা নিয়ে তিনি মাথা উঁচু করে ট্রাক থেকে নেমে তার জীপে উঠলেন। তার জীপে উঠা এবং তার জীপের দরোজা বন্ধ করার সাথে সাথে জনতার ভীড় যেন তার দিকে উপচে এল। এই সময় তার দিকে বন্দুক/পিস্তলের গুলি আসার আওয়াজ শুনলাম। গুলিগুলো জীপের উইন্ডশীল্ডে, দরোজার গ্লাস প্যানে ও দু'পাশের ষ্টীল-বেড়ায় লাগছিল। মনে হল পূর্বদিকের দু'পাশ ও ট্রাকটির উত্তর ও দক্ষিণ দিক এবং এভিন্যুর দক্ষিণ দিয়ে পেট্রল পাম্পের দিকের রাস্তা থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলিগুলো ছোঁড়া হচ্ছিল। জীপের বুলেটপ্রুফ উইন্ডশীল্ড ও জানালার গ্লাসপ্যান শেখ হাসিনাকে এসব ব্লাষ্ট ও বুলেট থেকে রক্ষা করেছিল। জীপের বাম পাশের দরোজা শেখ হাসিনার জন্য খুলে তাকে তুলে দিয়ে দেহরক্ষী মাহবুব (অবসরপ্রাপ্ত ল্যান্স নায়েক) জীপের পেছনে যেয়ে উঠতে চাচ্ছিলেন। এই সময় আমি আরেকটি ফ্লাসের ঝিলিক দেখি ও ব্লাষ্টের আওয়াজ শুনতে পাই। মনে হল এই একটি গ্রেনেড জীপটির প্রায় ৩ ফুট উত্তরে গিয়ে পড়েছে। গ্রেনেডের স্পি□ন্টার এবং সম্ভবত পিস্তল বা রিভলবার থেকে বেরিয়ে আসা একটি বা দুটি গুলি মাহবুবকে আঘাত করে। তিনি সেখানে বীরের মৃত্যুবরণ

করেন। গ্রেনেডের স্প্লিন্টার জীপটির গায়েও লেগেছে মনে হল। অন্যদের মধ্যে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও মেজর (অব:) শোয়েব জীপটির পেছনে বামদিকে উঠে দাঁড়ান। জীপটি ডানদিকে একটু ঘুরে সামনে পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে রাস্তায় ছড়ানো লাশগুলো এড়িয়ে দলের কর্মীদের দিয়ে সৃষ্ট পথ ধরে চলে যায়। নেত্রীর প্রতিরক্ষণের জন্য সরকার প্রদত্ত পুলিশ ভ্যানটি এই সময় কোথাও দেখা যায়নি। পরে জেনেছি প্রথম ব্লাষ্টের পর পরই ভ্যান ও ভ্যানে নিয়োজিত পুলিশ রক্ষীরা অকুস্থল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। জীপটির পেছনে সাদা পোশাকের পুলিশ রক্ষী সহ পুলিশ ভ্যানটি, যা আগে থেকেই জীপের পেছনে দাঁড়ানো ছিল, জীপটিকে অনুসরণ করে। এর পেছনে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কর্মচারী আরোহিত একটি এসইউভি চলা শুরু করে। অন্য পুলিশ ভ্যানটি কিছু সময় নিয়ে জীপটির অনুসারী হয়। পরে আমি শুনেছি যে এই পুলিশ ভ্যানটির সরকারি চালক অবস্থান থেকে পালিয়ে যাওয়ায় শেখ হাসিনার এক ব্যক্তিগত অনুচর এটিকে চালানোর ভার গ্রহণ করেন। গ্রেনেড বা বোমা হামলার সময় শেখ হাসিনার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পুলিশরক্ষীগণ তাকে রক্ষা করার জন্য কোনও অবস্থান নেয়নি, তাদের কাছে দেয়া অস্ত্র ব্যবহার করেনি, কিংবা যারা তাকে আক্রমণ করেছিল তাদেরকে ধাওয়া করেনি। পরে আমি জেনেছি যে, যে জীপটি ঐ দুটি গাড়ী সহ সুধা সদনে প্রায় ২০ মিনিট পরে পৌঁছেছিল।

হামলা শেষে জানা গেল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের তাক করে সেদিন সর্বমোট ১১টি গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছিল। প্রথম গ্রেনেডটি সিটি হোটেল ইমারত থেকে ছোঁড়া হয়েছিল বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয়টি একই গতি পথ অনুসরণ করেছিল। অন্যগুলো রাজ্জাকস নামীয় দোকান সংবলিত ইমারত থেকেও ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে। এটি সম্ভবত রমনা ভবনের পূর্ব পাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার সড়ক, যা পেট্রল পাম্প স্ট্রীট নামে অভিহিত, থেকেও ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে। ট্রাকের চারপাশে জনতার মাঝে লুকিয়ে আততায়ীরা সম্ভবত গ্রেনেড ছুঁড়েনি। ওসব স্থান থেকে ছোঁড়া হয়ে থাকলে যে বা যারা ছুঁড়েছিল তাকে বা তাদেরকে (গ্রেনেড ছোঁড়ার পর যে গ্রেনেড ছুঁড়েছে সে প্রতিরক্ষণ বিহীন হয়ে যায়) সহজে সনাক্ত করা ও ধরা যেত। পিস্তল/রিভলভারের গুলি সম্ভবত ট্রাকের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রশিক্ষিত পেশাদাররা জনতার ভীড়ে লুকিয়ে থেকে ছুঁড়েছিল। রাইফেল/বন্দুকের গুলি দু'পাশের ইমারত, সম্ভবত উত্তর-পূর্ব দিকের রাজ্জাকস্ নামীয় দোকান সংবলিত এবং দক্ষিণ পূর্ব কোণের সিটি হোটেল ইমারত থেকে ছোঁড়া হয়েছিল। গ্রেনেডগুলো পরে আরজিস ৮৪ লেখা গ্রেনেড হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছিল। এসব গ্রেনেড দেশের বাইরে, সম্ভবত: অষ্ট্রিয়ায় তৈরি। এগুলো সশস্ত্র প্রশিক্ষণ বা ঐ ধরনের যুদ্ধে ব্যবহার্য। এগুলো হয় সেনাবাহিনীর জন্য আমদানী করা, কিংবা দেশের অভ্যন্তরে বা প্রতিবেশী দেশের সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা চালনার জন্য চোরাচালান করে আনা

হয়েছিল। পরে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার মেজর (অব:) শোয়েব আমাকে বলেছে- এই ধরনের গ্রেনেড (আর্জেস ৭৪-৮৪) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। তিনি আরও বলেছেন যে কয়েক মাস আগে চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির প্রত্যন্ত এলাকার জেটি দিয়ে অস্ত্র চোরাচালানের সময় পুলিশ যেসব গ্রেনেড আটক করেছিল বলে দেখানো হয়েছে, এসব ঐ ধরনের গ্রেনেড। জানা যায়, যেসব গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছিল তার মধ্যে ৩টি ফাটে নাই। পরে পুলিশ এগুলো উদ্ধার করে এদের ফরেনসিক, ধাতুগত বা বিস্ফোরক ক্ষমতা পরীক্ষা না করেই ফাটিয়ে ধ্বংস করেছিল। মেজর (অব:) শোয়েব বলেছেন অবিস্ফোরিত এসব গ্রেনেডগুলো নিরাপত্তার জন্য হুমকি ছিল না এবং পুলিশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় এগুলো যেভাবে ও যে সময় ফাটিয়েছে, সেভাবে ও সে সময়ে সেগুলো ফাটানোর প্রয়োজন ছিল না। আমার বিবেচনায় এভাবে গ্রেনেডগুলো ফাটিয়ে বেআইনীভাবে সাক্ষ্যমূলক উপাদান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। আমার জানা মতে পরে বা কোন সময়েই পুলিশ অকুস্থল থেকে গুলির খোসা, পুড়ে যাওয়া স্প্লিন্টার, বুলেট বা পেলেট বা এই নারকীয় ঘটনার সম্ভাব্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ বা উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করেনি।

শেখ হাসিনার যাওয়ার পর আমি মাথা তুলে ও সামনে পাশে চেয়ে দেখলাম, ট্রাকের দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে রক্তমাখা অনেক লাশ, আহত লোকজন এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গাদি রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। আমি লক্ষ্য করেছি পূর্ব দিক থেকে একটি পুলিশ ভ্যান এসে ট্রাকটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থামল, ৫/৬ জন পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে নেমে, লাশগুলো, কয়েকজন আহত মানুষ ও বিচ্ছিন্ন হাত-পা ট্রাকে উঠিয়ে ঘুরে দ্রুতগতিতে পূর্বদিকে চলে গেল। এই পিক আপ ভ্যানটি ট্রাকের পশ্চিমে বা উত্তর দিক থেকে আসেনি। ট্রাকের উত্তর ও পশ্চিম দিকে ছড়ানো লাশ ও আহত মানুষজনকে আমাদের দলীয় কর্মীরা তুলে অ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস, গাড়ী ও রিক্সা ভ্যানে পাঠাতে থাকেন। কর্মীরা যখন মৃত ও আহতদের নিয়ে ব্যস্ত এবং অন্যরা দলের কেন্দ্রীয় অফিস ও আশেপাশে দোকানগুলো ও রাস্তার পূর্ব প্রান্তের দিকে নিরাপত্তার জন্য দৌড়ে যাচ্ছিলেন তখন পুলিশ তাদের উপর বেধড়ক লাটিচার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস শেল ছুঁড়ে। গোলাপ শাহ্ মাজারের দিক থেকেও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়। শৃঙ্খলা রক্ষার মোড়কে এর চেয়ে অধিকতর নিন্দনীয় অন্য কোনও কাজ পুলিশ এসময়ে করতে পারে বলে ভাবতে পারিনি। এভাবে লাঠিচার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে সম্ভবত পুলিশ অপরাধীদের অকুস্থল থেকে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। যে সংখ্যক পুলিশ তখন বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে মোতায়েন ছিল সে সংখ্যক পুলিশ ইচ্ছা করলে বা নির্দেশ পেলে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে সকল ব্যক্তিকে তালাশ করে অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারত। এ তারা করেনি বা তাদেরকে করতে দেয়া হয়নি।

প্রাথমিক শক কাটিয়ে উঠে ট্রাকে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম আমার গায়ের কুর্তা

পাজামা রক্তে ভিজে গেছে। আমি ভেবেছি গ্রেনেডের স্প্লিন্টার বা গুলি আমার শরীরে লেগেছে, ঘটনার সময় স্নায়ু কাজ করেনি বলে শরীরে কোনও ব্যথা অনুভাব করছি না। চারবছর আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে প্রথম দিকে এমনি আমি শরীরে কোনও ব্যথা অনুভব করিনি। দেখলাম রক্তমাখা শরীর নিয়ে শেখ সেলিম, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আমীর হোসেন আমু, হানিফ, সাহারা খাতুন, হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্রাক থেকে নেমে যাচ্ছেন। তাদের পেছনে সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, ট্রাক থেকে পা টানতে টানতে নেমে গেলেন। প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমান ঘটনার শকে নিশ্চুপ নিথরভাবে ট্রাক-ডেকে শুয়ে পরেছিলেন। তাকে কয়েকজন দলীয় কর্মী ট্রাক থেকে তুলে নামিয়ে নিয়ে যান। আমার ঠিক পেছনে সারা শরীরে রক্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য, কাজী জাফরউল্লাহ্। তিনি আমাকে বললেন, আমি আহত, আমাকে ছেড়ে যাবেন না। কয়েকজন দলীয় কর্মীর সহায়তায় তাকে আমি ট্রাক থেকে নামিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে ঢুকলাম। ঢোকার পথে জনতার প্রচণ্ড চাপে আমরা প্রায় পদপিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম। জনতার এই চাপ এসেছিল পুলিশ বাইরে লাঠিচার্জ করছিল ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ছিল বলে। টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়ার শব্দের মাঝে পিস্তলের গুলির আওয়াজও শুনেছি মনে হল। দেখলাম কেন্দ্রীয় অফিসের নিচ তলায় রক্তে ভেজা জামা-কাপড় গায়ে দাঁড়িয়ে বা বসে আছেন আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ওবায়দুল কাদের, হানিফ ও আরও অনেকে। তিল ধারণের জায়গা নেই। আমি কাজী জাফরউল্লাহকে কয়েক'জন কর্মীর সহায়তায় টেনে ধরে তৃতীয় তলায় উঠালাম। দ্বিতীয় তলার কামরাগুলো তালাবন্ধ ছিল। এ কামরাগুলো দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত শাহজাহানকে কোথাও পেলাম না। পরে শাহজাহানকে মিরপুরের সেলিনা জেনারেল হাসপাতালে স্প্লিন্টারে আহত অবস্থায় দেখতে পাই। তিন তলায় আমি কাজী জাফরউল্লাহকে একটি বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিয়ে দেখি তার পালস দুর্বল। তার শরীরের বা'দিক রক্তে ভেজা। তিনি তার বাম হাতে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে বললেন। বললেন তার চোখের দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। আমি অ্যাম্বুলেন্স যোগার করার জন্য নীচে দৌড়ে নেমে আসি। অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে আমি তিন তলার ছাদে দৌড়ে উঠলাম চারদিক দেখব বলে। দেখলাম উত্তর দিকে জিপিওর বরাবর কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধুয়ো উঠছে। তারপর পূর্বদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম– রাজ্জাক'স নামীয় দোকান সংবলিত ইমারতের ছাদের উপর পুলিশের খাকি শার্ট ও নিচে লুংগি পরিহিত ৩ জন রাইফেলধারী লোক দাঁড়িয়ে। একজন দলীয় কর্মী চিৎকার করে আমাকে তখুনি সরে যেতে বললেন। আমি দৌড়ে তিন তলায় কাজী জাফরউল্লাহ্‌র পাশে চলে এলাম। এই সময়, প্রায় ৬টা ২০ মিঃ তখন, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী দৌড়ে উপরে উঠে আসলেন। সাবের হোসেন ও মতিয়া চৌধুরী, শেখ হাসিনা যে মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন বলে এসেছিলেন, তার আগের দিকে সমাবেশকে নূর হোসেন

চত্বরের কাছে সংগঠিত করছিলেন। সেজন্য গ্রেনেড হামলায় তারা আঘাত পাননি বা আহত হননি। তিনি বললেন, গ্রেনেড হামলা থামার পর তিনি কেন্দ্রীয় অফিসে ছুটে এসে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও অন্যান্য নেতাদের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মোবাইল ফোন ও লোক মারফত আমরা কাজী জাফরউল্লাহ্‌র জন্য অ্যাম্বুলেন্স আনতে চেষ্টা করলাম। বিফল হয়ে হাসপাতালে নেয়ার জন্য কিছু না কিছু একটা জোগার করা যাবে বলে আমরা তাকে নিচে নামিয়ে আনলাম। এদিক ওদিক দৌড়ে একটি রিক্সা ভ্যান জোগার করে তাকে মাঝখানে বসিয়ে একদিকে আমি আর একদিকে সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যাওয়ার পথে সচিবালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাংলাদেশ রাইফেলের একটি চৌকস দলকে মোতায়েন দেখলাম। ওসমানী মিলনায়তনের কাছে একটি গাড়ী পেয়ে কাজী জাফরউল্লাহকে তাতে উঠিয়ে আমি আর সাবের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের দিকে ছুটলাম। বাংলাদেশ রাইফেলের ঐ দলকে সচিবালয়ের মোড়ে মোতায়েন দেখে আমাদের বড় বেখাপ্পা লাগল। আগে থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তৈরী না রাখলে গ্রেনেড হামলার ঘটনার পর এত অল্প সময়ে বিডিআর দল সেখানে মোতায়েন হতে পারত না। মনে হল একটি সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কর্মসূচীর আওতায় এই ধরনের ঘটনার পরপরই বিডিআর এর দল নিয়োজিত করার ব্যবস্থা ছিল।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের প্রবেশ মুখে এসে দেখলাম বিভাগের দরোজা তালা বন্ধ। বলা হল ভেতরে ইতোমধ্যে এত বেশী আহত ব্যক্তি এসেছেন যে কর্তব্যরত ডাক্তাররা আর কারও চিকিৎসা করতে পারবেন না। জরুরী বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ডাক্তারদের এহেন আচরণ দেখে আমরা হতবিহ্বল হয়ে ইস্কাটনের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে কাজী জাফরউল্লাহকে নিয়ে যাই। এই ক্লিনিকের ডাক্তার ও সার্জনরা কাজীর সাথে আগ থেকেই পরিচিত ছিলেন। চেনা ডাক্তার ও সার্জনদের কাছে কাজীকে হস্তান্তর করে আমরা সুধা সদনের দিকে ছুটে যাই। সুধা সদনে আমরা রাত ৮.২৫ মিনিটের দিকে পৌঁছি। শ'য়ে শ'য়ে বিক্ষোভে ফেটেপড়া জনতা তখন সুধা সদনের সামনে। শেখ হাসিনার নিরাপদে আছেন দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। নেত্রী খানিকটা বিমর্ষ অথচ দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। তিনি স্বভাবসুলভ আত্ম-প্রত্যয়ের সাথে সমবেত সবাইকে সাহস ও ক্রাইসিস মোকাবিলা করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে আহতদের নিয়ে যথা-প্রয়োজন চিকিৎসা করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। খানিক পরে হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছুটে এসে শেখ হাসিনাকে তাদের দুঃখ, সহানুভূতি, বিক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা জানান। সেদিন রাত্রে ও পরদিন আমি বুলেট ও স্প্লিন্টারে আহতদের দেখি– অন্যান্যদের মত সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও কাজী জাফরউল্লাহকে শমরিতা হাসপাতালে, মোহাম্মদ রাজ্জাক ও ওবায়দুল কাদেরকে শিকদার

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, মোহাম্মদ নাসিম, বাহাউদ্দিন নাসিম ও বজলুর রহমানকে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, শাহজাহান ও দীপ্তিকে সেলিনা জেনারেল হাসপাতালে এবং আরও প্রায় ৩০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে এসে ডাঃ মোস্তফা জালাল মহীউদ্দীন সহ হামলায় নিহত ১৮ জনের লাশ ময়না তদন্তের পর নেয়ার জন্য অপেক্ষা করি। ময়না তদন্ত শেষ হওয়ার ১০ ঘণ্টা পর রাত ৮.৩০ মিনিটের দিকে পুলিশ এদের লাশ আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। ২২ আগষ্ট বিকালে শোক মিছিলে যাতে আমরা লাশ নিয়ে যোগ না দিতে পারি তার জন্য উপরের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ লাশ হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটিয়েছিল। এই সময় জানা যায় যে বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে দায়সারাভাবে এইসব লাশের ময়না তদন্ত শেষ করা হয়েছিল। এই নারকীয় অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের লক্ষ্যে এই দু'দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা করা বা জবানবন্দী নেয়া হয়নি। ঐ ২২ আগষ্ট তারিখেই এ ঘটনার উপর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের সইকৃত এজাহার রমনা থানার পুলিশ গ্রহণ করেনি। গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে রমনা থানার পুলিশ বলেছে যে অকুস্থল বঙ্গবন্ধু এভিন্যু রমনা থানা নয়, মতিঝিল থানার অন্তর্ভূক্ত। অথচ ময়না তদন্ত করার জন্য নিহতদের লাশ নিয়ে এসে তদন্ত শেষে লাশগুলো হস্তান্তর করতে রমনা থানার পুলিশই উপরস্থ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছে। একই এজাহার ঐ দিন মতিঝিল থানায়ও গ্রহণ করা হয়নি। মতিঝিল থানার তরফ হতে এজাহার গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে তারা এর আগে একজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এজাহার গ্রহণ করেছে। একই ঘটনার বিষয়ে, তাদের মতে দ্বিতীয়বার এজাহার গ্রহণ করা যায় না। এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশের দেয়া এজাহার ঐ দিন ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে ভাংচুর ও পুলিশকে কর্তব্য কাজে বাঁধা দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

২১ আগষ্ট ১৮ জন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর গ্রেনেড হামলায় নিহত হয়েছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় নেতা আইভি রহমান আরও তিনজন কর্মী একই হামলায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পাঁচশ'র বেশী নেতাকর্মী এই নারকীয় হামলায় আহত হন। এদের মধ্যে অনেকেই এত গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন যে এদের জন্য দেশের বাইরে বিশেষায়িত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। আহতদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার বা হেনস্থা হওয়ার আশংকায় গণ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাননি। পুলিশ যে সব লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে সময়, সেগুলো শোনা যায়, ২২ আগষ্টের রাতে শাহজাহানপুর গোরস্থানে লোকচক্ষুর আড়ালে মাটি চাপা দেয়া হয়। সে রাত্রে দু'শতাধিক পুলিশ গোরস্থান ঘিরে তাদেরকে যা করতে বলা হয়েছিল তাই

করেছে বলে শোনা গেছে। ২১ তারিখে রাতেই আহতদের চিকিৎসা এবং নিহতদের অসহায় পরিবার-পরিজনকে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে শেখ হাসিনা একটি বিশেষ তহবিল খোলেন। এই ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও সরকার আহতদের চিকিৎসা বা সহায়তা দেয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ২২ আগষ্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে যেয়ে দেখি তারা তাদের পরিজন ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের দিয়ে স্যালাইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র হাসপাতালের বাইরে থেকে কিনে আনছেন। এই হাসপাতালে তাদের প্রতি চিকিৎসামূলক মনোযোগ হয় সামান্য মাত্রায় দেয়া হয়েছে, নয় একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র সচিব, তাদের অফিস থেকে এই নারকীয় ঘটনার স্থান ৩০০ গজের বেশী না হওয়া সত্ত্বেও, তা সরেজমিনে দেখতে যাওয়ার সময় পাননি। পুলিশের মহাপরিদর্শক, মহানগরের পুলিশ কমিশনার ও তার ডেপুটিগণ ঘটনাস্থল দেখতে গিয়েছিলেন কিনা জানা বা দেখা যায়নি।

আমার বিবেচনায় এই নারকীয় অপরাধের ঘটনা উঁচু পর্যায়ে কর্মরত কিংবা যোগসূত্র সংবলিত কতিপয় ব্যক্তি ঘটানোর জন্য অতীব যত্নের সাথে পরিকল্পনা করেছিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমরাস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী একটি ভাড়াটে দল। আর এতে সহযোগিতা করেছিল পুলিশ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের ভাড়াটিয়া পেশাদার সন্ত্রাসীরা, যাদের ছত্রছায়ায় হামলাকারীরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পরে আমি জানতে পেরেছি যে এর আগে ১৬ ও ১৮ আগষ্ট শেখ হাসিনার টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থানের সময় তাকে লোকবল ও অস্ত্রের মানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগের চেয়ে অনেক বিস্তৃত স্কেলে প্রতিরক্ষণ দেয়া হয়েছিল। ২১ আগষ্টে অনুষ্ঠিতব্য বিক্ষোভ মিছিল-পূর্ব সভায় তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাদের উদ্বিগ্নতার মাত্রা কমিয়ে আমাদের দল থেকে সাধারণতঃ দেয়া নিরাপত্তার বেষ্টনী টেনে ধরার অসৎ উদ্দেশে এ করা হয়েছিল। সুপরিকল্পিতভাবে এসব লোকদেখানো ব্যবস্থার মোড়কে দৃশ্যত পুষ্পশোভিত পথ ধরে টেনে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে এরা বঙ্গবন্ধু এভিন্যুকে সেদিন মৃত্যুর উপত্যকায় ঠেলে নামিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ভোরের কাগজ, সমকাল, সংবাদ, অবজারভার, ইনডিপেনডেন্ট
২১. ০৮. ২০০৫